খণ্ড ১৪, সংখ্যা ১৬ ভাবনগর ডিসেম্বর ২০২১
Vol. 14, No. 16 BHĀBANAGARA December 2021

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব লোকে কয়, সাধুসঙ্গ পাওয়ামাত্র জীব পরমপ্রাপ্ত হয়

বাউল-ফকিরদের একটি কৃত্যমূলক ঐতিহ্যের বয়ান : লালনপন্থী সাধকদের সাধুসঙ্গের করণ-পরম্পরা

দেবোরাহ এলিয়েট কুকিয়েরম্যান

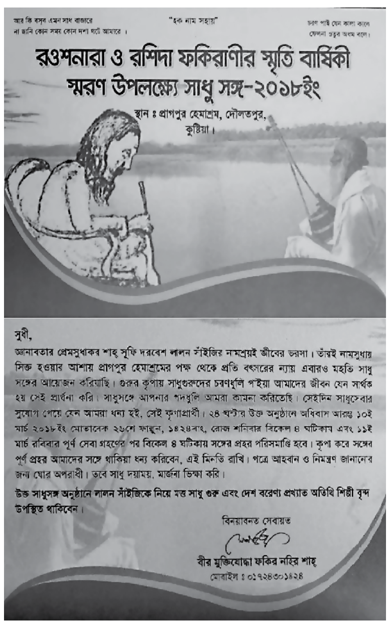

সাধুসঙ্গের মুদ্রিত আমন্ত্রণপত্র

The Cultural Institution of Baul-Fakir Sadhusongo as Practised in the Lineage of Lalon : Description and Analysis

Deborah Eliette Cukierman

Abstract

In this article dedicated to the memory of the daughter of her guru Fakir Nahir Shah, Ranjona Fakirani (Buri Ma), who passed away suddenly in July 2021, Deborah Eliette Cukierman (alias Deborah Zannat) takes on an important chapter in the Baul-Fakir culture: the sadhusongo. As both a yogin sadhika and an academic researcher, she uses her own field observations and practices, discussions with sadhugurus of the Lalon lineage, and theories from anthropology and sociology, to weave philosophical meaning into the descriptions of what it takes for a sadhusongo to run out successfully. From the preparations and rules of invitation, to the event's full timeline, spanning from the songs of inauguration and set-up of the main asana (seat of the Divine) with offerings of food and flower, light and incense, through the habits of discussion in music medium, all the way to the high point of resolution steeped in narrative-based myths of Radha-Krishna – no part of the cultural event is left untouched. Her hope is to help the reader produce a proper conception of what sadhusongos are about, and remove false ideas related to the lineage of one of the most talked-about spiritual sects of Bengal, by showing in simple straightforward terms what idealist humanism can – and should – be about.

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে যখন একা একা নতুন সফরের পরিকল্পনা করছি তখন একই সপ্তাহে দুই জন আমাকে বাংলাদেশে যেতে বলল। এই কথাটি শোনার পরে ঐশ্বরিক ইঙ্গিত বা হুকুম ভেবে খুঁজতে লেগেছিলাম বাংলাদেশে গেলে কোথায় যাব বা কী দেখব। এই সন্ধানের মধ্যে অনলাইনে ইউনেস্কোর নির্মিত বাউল সমাজ নিয়ে একটা ছোট ডকুমেন্টারি দেখতে পেয়েছিলাম। এই ডকুমেন্টারিতে বাউল দর্শনের এমন একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল যে, এটা সর্বসম্প্রদায়িক, মানুষ-কেন্দ্রিক (গুরুবাদ), আনন্দময় (সংগীত), অনুমান বাদ দিয়ে বর্তমান ভিত্তিক (আধ্যাত্মিক যোগ), আত্মজ্ঞান অর্জন করার একটা সাধনা; যার উদ্দেশ্য নিজেকে মুক্তমানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই বর্ণনাটি আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বাংলাদেশে গিয়ে সাধুসঙ্গ দেখতে যাব।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলাম ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমার সঙ্গে বাংলাদেশে এলো আমার প্রিয় বন্ধু ফরাসি আলোকচিত্রকর অলিভিয়ে রেমুয়ালডো (Olivier Remualdo)। ঢাকা থেকে আমাদের পাঠান হল কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার প্রাগপুর গ্রামে। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যাঁকে আমি গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছি, তাঁর আশ্রমে এক রাত কাটিয়ে, দুপুর বেলায় আমরা সবাই চলে গেলাম পাশের গ্রামে, আদাবাড়িয়ায়, ফকির মহরম শাহের আখড়াতে, 'আরশি নগর' নামে। চারদিকে তামাকভরা মাঠ, মাঘ মাসের শেষ শীতের বাতাস। গুরুকে ধরার পরে, প্রাগপুরে স্থায়ী হয়ে, এই গত ছয় বছর ধরে সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতা বেড়েছে আমার বটে...। কিন্তু এখনও স্মৃতিচারণ হিসেবে খুব স্নেহময় একটা অনুভব পাই ঐ প্রথম সাধুসঙ্গের স্বাদ ও ঘ্রাণ স্মরণ করতে গেলে। কঠিন আতিথেয়তা, আন্তরিকতা, সহিষ্ণুতা গুণে যে ভক্তি, আনন্দ ও প্রেমময় পরিবেশ তৈরি করা হয় সাধুসঙ্গে, শৃঙ্খলার মাধ্যমে – তার পরম উদাহরণ পাই ঐ স্মৃতিতে।

আমাদের গুরু ফকির নহির শাহ্ প্রায় গল্প করে যে, যখন তিনি ইন্টারে পড়তেন তখন ইংরেজি ক্লাসে একটা ছোট উপন্যাস পড়েছিলেন, যার মূল শিক্ষা ছিল: "tragedy is natural, happiness is artificial"। অতএব দুঃখ স্বাভাবিক – ক্ষুধা, ক্লান্তি, রোগ বা শোক যা-ই বলুন। বরং আনন্দ তৈরি করতে হয়। এই আনন্দ তৈরি করার কৌশলের নাম শৃঙ্খলা। আমার গুরুর গুরু খলিশাকুন্ডি গ্রামের ফকির লবান শাহ্, তিনি তাঁর সাধু সমাজের জন্যে সাধুসঙ্গের নিয়ম-বিধান স্থিরভাবে ব্যবস্থা করে গেছেন। কোন সময়

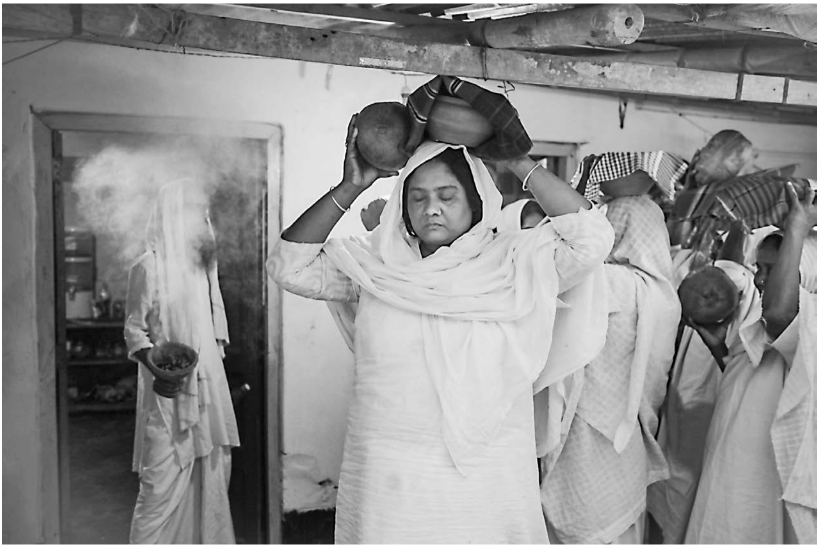

সাধুসঙ্গের কৃত্যাচারে রঞ্জনা ফকিরানী ওরফে বুড়ি মা ও অন্যান্য

কী করা প্রয়োজন, সাধুসঙ্গ করতে করতে সেই বিধানটি আরও নিখুঁত করা হয়েছে। তাঁর আদর্শ-আদেশের অনুযায়ী অন্য বাউল-ফকির সাধুগুরু কুলের চাইতে আমাদের বর্তমান সাধুসঙ্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ অনেক ব্যতিক্রম হয়ে গেছে। সাধুগুরুর দাওয়াত থেকে শুরু করে অধিবাস এবং বিদায় পর্যন্ত যে-সময়সূচি পালন করা হয়, এ সব বস্তু, কর্ম ও কর্মের মর্ম নিয়ে এই প্রবন্ধে আমাদের সাধুসঙ্গের বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

আমাদের গুরুর একমাত্র কন্যা রঞ্জনা ফকিরাণী ওরফে বুড়ি মা ছোট কাল থেকে সাধুসঙ্গ করতেন, পরে তিনি সাধুসঙ্গের সব দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর সার্বিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অবিরাম পরিশ্রম দিয়ে বুড়ি মা সাধুসঙ্গ পরিচালনা করতেন তাঁর নিজের আখড়াতে (পাককোলা গ্রামে 'আনন্দ ধাম'), তাঁর গুরুর আখড়াতে ('জ্যোতি ধাম') এবং তাঁর পিতার ধামে ('হেম আশ্রম')। বুড়ি মা অকালে দেহ ত্যাগ করেছেন, ১৪ জুলাই ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে। সাধুসঙ্গ নিয়ে আমার গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও শিষ্য হয়ে অংশগ্রহণের ফল হিসেবে দাঁড়াচ্ছে—এই প্রবন্ধ, যেটা বুড়ি মা'র স্মরণে উৎসর্গ করছি।

যুগ পরিবর্তনে সাধুর সংখ্যার পতনের পাশে শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, সাধুসঙ্গের নিয়মও পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের নানান রূপ নিয়ে প্রবন্ধের সূত্রে সূত্রে বর্ণনা করা হবে। সময়ের স্রোত তুলে ধরে, এই প্রবন্ধের গড়ন করেছি এই ভাবে: প্রথমে যা কিছু অগ্রিম প্রস্তুতি হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়, দ্বিতীয় বিভাগে আগমন থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত, অধিবাস বললে চলবে, এবং তৃতীয় ও শেষের অংশে সাধুসঙ্গের পূর্ণ দর্শন-বস্তু, ভোর থেকে বিকেলের বিদায় পর্যন্ত। আশা করি, পাঠক বুঝতে পারবেন আমাদের এই ধারা নিয়ে সাধারণ সমাজের মধ্যে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে ও গণমাধ্যমে পূর্বে কত ভুল ধারণা প্রচার করা হয়েছে।

ক/ 'সাধুসঙ্গ করো তত্ত্ব জেনে, সাধন হবে না অনুমানে' — শাস্ত্রীয় অনুমান থেকে সাধুসঙ্গের বর্তমানে আনা

সাধুগুরুর একাধিক বাণী পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে শ্রোতাকে সাধুসঙ্গে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়, এবং সাধুসঙ্গের দর্শন-ভিত্তি বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই বিশেষ একটা গানের কথা মনে পড়ে। ফকির খোদাবক্স সাঁইয়ের ভণিতায় পাওয়া গানটি হলো:

শুভ সাধুসঙ্গ লয়ে সাঙ্গপাঙ্গ,
বনবিহঙ্গ প্রসন্ন করিলে।
জলে ফুটেছে কমল, হল সরবর উজ্জ্বল,
নবপল্লব তরুতল ছায়া সুশীতলে॥

নব নিত্য ফুলে ভরিল ডালা,
কুড়াইয়া কেহ গাঁথিল মালা।
তাই হয়েছে উজালা, মুখে যায়না বলা,
যেমন তারার মালা চাঁদের গলে॥

অহৈতুকিং স্বর্গ, শাস্ত্রে শোনা যায়,
সাধুসঙ্গে তার সত্য প্রমাণ হয়।
ভক্তি বলে তাই যেজন ধিয়ায়,
হয়েছে উদয় নয়ন-সলিলে॥

সচিদানন্দ রূপে হলে আবির্ভাব,
শুদ্ধভাবে ভেবে ভক্তের হল লাভ।
বক্সের নাই সে ভাব, হইল বৈভব,
সুভাবের ভাব দরবেশ শুকচাঁদ সাঁই বলে॥

আরেকটা গানের কথা উল্লেখ করছি, লালন সাঁইয়ের নামে প্রচলিত। যেখানে গবেষকের সাধারণ নজরদার অনুমান-বর্তমান বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে।

সাধুসঙ্গ করো তত্ত্ব জেনে। সাধন হবে না অনুমানে॥

সাধুসঙ্গ করো রে মন, অনর্থ হবে বিবর্তন।
ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয় দমন, হবে রে সঙ্গগুণে॥

নবদ্বীপে পঞ্চতত্ত্ব, ও তাঁর স্বরূপে রূপ আছে তত্ত্ব।
ভজন যদি হয় গো সত্য, গুরু ধরে নেও গে জেনে॥

আদ্য যদি সঙ্গ করে কোন ভাগ্যবানে, সেই তো দেখছে লীলা বর্তমানে।
সিরাজ সাঁই কয় লালন যাস নে অনুমানে, সেই শ্রীবাস অঙ্গনে॥

ভারতীয় গবেষক সুধীর চক্রবর্তীর *ব্রাত্য লোকায়ত লালন* বইয়ের মধ্যে আয়ুর্বেদ দর্শনশাস্ত্র 'চরক সংহিতা'র কথা উল্লেখ করা আছে, এই উপমহাদেশের লোক-সংস্কৃতির

অনুমানের অর্থ বুঝাতে। এই প্রাচীন দর্শন অনুযায়ী অনুমান তিন প্রকার— কারণ-অনুমান, কার্য-অনুমান ও সামান্যদৃষ্ট-অনুমান। অনুমানের বিপরীতে, সাধুসঙ্গকে যদি বর্তমান হিসেবে ধরা হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এই বর্তমানের পূর্বস্তর কোন ঠিকানায় পাওয়া যায়। তাই, এই তিনটি ধরন নিয়ে সাধুসঙ্গের তিনটি অগ্রিম প্রস্তুতির কথা এখানে তুলে ধরতে যাচ্ছি। সেগুলো হলো— উপলক্ষ্য, দাওয়াত, ও পরিবেশ ও সেবা ব্যবস্থা।

ক.১/ কারণ-অনুমান — উপলক্ষ্য

প্রথমত কেন এই সাধুসঙ্গ আয়োজিত হচ্ছে, অর্থাৎ তার কারণ-অনুমানটা কী? এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা উচিৎ। বলা বাহুল্য, একটা সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় নানান কারণ-অনুমানে। কিছু সাধুসঙ্গ বছর পর বছর একই তারিখে আয়োজিত হয়। যেমন, লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস (মৃত্যু-বার্ষিকী প্রতি বছর পহেলা কার্তিক) ও তাঁর নিজের অভ্যাস মোতাবেক মঙ্গলময় দোলপূর্ণিমা তিথিতে (ফাল্গুন মাসে যে পূর্ণচাঁদ উঠে সেই দিনে)। নরসিংদীর ফকির হুমায়ূন শাহের অভ্যাস মোতাবেক লালন সাঁইয়ের সমাধির চল্লিশায় তাঁর আখড়াতে একটা সাধুসঙ্গ আয়োজিত হয়। কেউ গুরু-বার্ষিকীর নামে, অর্থাৎ যে-তারিখে গুরুর কাছে বায়াত বা দীক্ষিত হয়েছে সেই তারিখেই সাধুগুরুকে ডেকে তাঁর আত্মসমর্পণ ও নফসকে কুরবানি করার অঙ্গিকার স্মরণ করে। আবার সাধুগুরুর মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁরা গুরু-বার্ষিকীর পরিবর্তে তাঁদের খেলাফত (বৈরাগ্যবস্ত্র) প্রাপ্তির বার্ষিকী অনুষ্ঠিত করে।

গ্রামাঞ্চলে সাধুসঙ্গের আর একটা কারণ দেখা যায়—যার নাম 'মানত'। 'মানত সাধুসঙ্গ' আয়োজিত হয় একটা প্রতিশ্রুতি বা নিয়াতের বিনিময়ে। কেউ একজন বা বিশেষভাবে একটা শিশু যখন রোগ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং সেই অসুখ সহজে ছেড়ে যাচ্ছে না। তখন বিশ্বাসের উপরে, সেই অসুখ-আরোগ্য করার ক্ষমতা সাধুগুরুর হাতে ছেড়ে দেয় এবং অঙ্গিকার করে যে, রোগটি যদি ছেড়ে যায় তাহলে পাঁচটা সাধুগুরুকে ডেকে তাঁদের সেবা দেওয়া হবে। অন্য উপলক্ষ্যের চেয়ে 'মানত সাধুসঙ্গে'র নিয়ম সাধারণ্যে হাল্কা-পাতলা করা হয়, কখনও কখনও ২৪ ঘণ্টা না ধরে, মাত্র ১২ ঘণ্টা ধরে করা হয়।

ক.২/ কার্য-অনুমান - দাওয়াতের বিধান ও পঞ্চঘরের পরিচয়

দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে কার্য, অর্থাৎ সাধুসঙ্গ আয়োজিত হয় সাধুগুরুর উপস্থিতিতে। সুতরাং সাধুসঙ্গের পূর্বে সাধুগুরুর উপস্থিতি ঘটানো হয়। ভক্তের ধারণায় সাধুগুরু সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁদের চরণধূলির আশাতে, বিশেষ দাওয়াত দেওয়ার কায়দা পালন করা হয়।

হাঙ্গারিয়ান অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী কার্ল পোলান্যি [Karl Polanyi (১৮৮৬-১৯৬৪)] দেখিয়েছেন যে, যেকোনো সমাজে তিন প্রকার বিনিময় ঘটে থাকে। এই তিন প্রকার হচ্ছে— পারস্পরিক, বিতরণকর ও ব্যবসায়িক। এর পাশে ফরাসি নৃবিজ্ঞানি মারসেল মোস [Marcel Mauss (১৮৭২-১৯৫০)] উপহারের রীতিনীতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, উপহার বা পারস্পরিক বিনিময় একটা নির্দিষ্ট সমাজের সদস্যকে বাধ্য করে। অতএব এই চলমান বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজের পরিচয় বা অস্তিত্বের একটা বন্ধন রূপ বা বাধ্যতামূলক লেনদেন গড়ে ওঠে। ফলে, সাধুগুরুকে দাওয়াত দিতে গেলে, সাধুগুরুর মান্য বুঝে এই সমাজটির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ তৈরি হয়। মূলত সাধুসমাজ চার ভাগে বিভক্ত— আপন গুরু ও তাঁর গুরুর পরম্পরা, গুরুর ঘরে খেলাফত প্রাপ্ত সাধুগুরু,

সাধুসঙ্গে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে রিজিয়া ফকিরানী ও অন্যান্য সাধিকা

অন্য ঘর থেকে আগত সাধুগুরু, এবং ভক্তবৃন্দ (যাদের মধ্যে দীক্ষিত থাকতে পারে, আর শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে পারে)।

তাই, সর্ব প্রথমে সাধুসঙ্গ যোগের তারিখ আপন গুরুর কাছ থেকে নিশ্চিত করে তাঁকে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে। কঠোর ভক্তি দিয়ে তাঁর হাতে দক্ষিণা দিতে হয়। যৌক্তিকভাবে এই দক্ষিণা দিয়ে তাঁকে শুধু সম্মান দেখানো হয় না, একই সাথে তাঁর আসা-যাওয়ার খরচ বা পথের ভাড়াও দেওয়া হয়। গুরু এই দক্ষিণা গ্রহণ করার মানে দাওয়াতটি গ্রহণ করা হল এবং তাঁর কৃপাতে সাধুসঙ্গটি অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এর পরে সুযোগ অনুযায়ী সাধুগুরুদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তাঁদের সাথে দেখা করতে হবে এবং একইভাবে তাঁদের দাওয়াত ও দক্ষিণা দিতে হবে—শ্রেণি ও পথের দূরত্ব বুঝে।

এই দক্ষিণার বিনিময়ে সাধুগুরুর উপস্থিতি বাধ্য হয়। এই উপহার গ্রহণ করা একটা পারস্পরিক বিনিময়। এখানে লালন সাঁইয়ের এই জনপ্রিয় বাণী মনে পড়ছে—‘কবে সাধুর চরণ ধূলি মোর লাগবে গায়’, যার শেষ অন্তরায় এই কথাটি দেওয়া আছে ‘শুনেছি সাধু করুণা’। যদিও অর্থের মাধ্যমে সাধুগুরুকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তবুও দেখা যাচ্ছে যে, হাঙ্গারিয়ান অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী কার্ল পোলান্যির তিন প্রকারের বিনিময় প্রথার মধ্যে এই অর্থের বিনিময় ব্যবসায়িক-বিনিময়ের মতো নয়। কেননা, করুণার গুণে ব্যাংক-নোটের চেয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নম্র-নত ভাবের দাম এই বিনিময়ে বেশি থাকে। কয়েকবার দেখেছি দামি নোট দিলেও একটা দাওয়াত গ্রহণের অযোগ্য মনে করা হয়; বরং দেখেছি ছোট নোট দিয়ে সরল আনন্দে দাওয়াত গ্রহণ করা হয়।

লালন সাঁই তাঁর দোলপূর্ণিমার সাধুসঙ্গে একটা নিয়ম পালন করতেন, সেটা হচ্ছে— পঞ্চঘরের সাধুগুরুকে নিয়ে সাধুসঙ্গ করা। পঞ্চঘর বলতে— লালন সাঁইয়ের ভক্তবৃন্দ ও শুভাকাঙ্ক্ষী (যা 'লালনের ঘর' নামে খ্যাত), সতী মার ঘর, উজল চৌধুরীর ঘর, ফকির পাঞ্জু শাহ্ আর দেলবার শাহ্-এর ঘর। লালন সাঁইয়ের ঘর বাদে, বাকি চার ঘরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে যতটুকু তথ্য খুঁজে পেয়েছি, তা এখানে তুলে ধরছি।

গীতিকার সাধুদের জীবন-কাহিনী খুঁজে পাওয়া একটু সহজ হয়। কারণ, তাঁদের বাণী ঐতিহ্যমূলক সাংস্কৃতিক বস্তু হিসেবে মানুষের মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত করে।

সতী মা ছিলেন কর্তাভজা ধারার প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদের ভক্ত রামশরণ পালের সহধর্মিণী, পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কল্যাণী গ্রামের নিবাসী, এবং তিনি দেহ ত্যাগ করেন ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে।

উজল চৌধুরী ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নেহালপুর গ্রামের আবাসী, একজন সাধু। এছাড়া তাঁকে নিয়ে আমাদের কাছে বর্তমানে আর কোনও তথ্য নেই।

ফকির পাঞ্জু শাহ্ ছিলেন হরিশপুর গ্রামে সুফিতত্ত্ববিদ হিরাজতুল্লাহ খোন্দকারের ভক্ত। তিনি ১২৫৮ বঙ্গাব্দ (১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দ)-এর ২৮শে শ্রাবণ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা গ্রামে তাঁর জন্মগ্রহণ এবং ১৩২১ বঙ্গাব্দ (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)-এর ২৮শে শ্রাবণ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ড থানার হরিশপুর গ্রামে দেহ ত্যাগ করেন।

দেলবার শাহের পরম্পরগত প্রবীণ শিষ্য খেলাফত প্রাপ্ত সাধু, কুষ্টিয়া মিরপুর থানা বড়বাড়ীয়া গ্রামে ফকির রিয়াজ শাহ্, ফকির লবান শাহের অনেক নিকট বন্ধু ছিলেন। ফকির রিয়াজ শাহ্ দেহ ত্যাগ করেন বৃদ্ধবয়সে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চঘরের প্রাপ্ত সাধুর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অনেক কষ্ট হয়। একদিকে লালন সাঁইয়ের অসম্প্রদায়িক জনপ্রিয়তা, আর অন্যদিকে মরমীয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বা কৌতূহল হারানো, এই দুটি কারণ চিহ্নিত করলাম।

ক.৩/ সামান্যদৃষ্ট-অনুমান - সেবা ব্যবস্থা ও অন্যান্য

'সেবা ইবাদত', 'সাধু সেবায় আসমানে ঘণ্টা বাজায়'— এই কথাগুলো আমাদের গুরু ও অন্য সাধুগুরুর মুখে প্রায় শোনা যায়। লালনপন্থীদের একটা সাধুসঙ্গে গেলে, কয়েকটা খাদ্য-ভিত্তিক সেবা দেওয়া হয়, সময় সূচির ক্রমানুযায়ী (সেবা ব্যাপারটি আরও বিস্তারিতভাবে ধরব পরবর্তী অংশে)। এশার সময় [সন্ধ্যার পর] দ্বীন ডাকার পরে মুড়ি ও চা সেবা, গভীর রাতে অধিবাস সেবা, গোষ্ঠ মুড়ি, সকালে বাল্য সেবা, ও দুপুরে পূর্ণ সেবা। প্রশ্নোত্তরে আমাদের গুরু বলে থাকেন যে, সাধুসঙ্গের কোনো বিধিবদ্ধ হিসাব নাই — আয়োজকের আর্থিক অবস্থা ও মনের বাসনা থেকে যতটুকু করা সম্ভব তাই করলে চলবে। প্রতিকার চাইতে যেমন প্রতিরোধ ভালো তেমনি সাধুসঙ্গের সেবা আয়োজন দেখলে বোঝা যায় যে, অগ্রিম অভিজ্ঞ ব্যবস্থা করা সেরা। অতঃপর আয়োজক ভক্ত একটা বিশ্বাসের উপরে চলতে থাকে, যে বিশ্বাসটি হলো—সাধুগুরুর উপস্থিতিতে কোনো অভাব ঘটতে পারে না। তাই একটা নিয়ম হচ্ছে, ভিক্ষা করে সাধুসঙ্গের সাধুগুরুর সেবার উপাদান খুঁজে নিতে হয়, কমপক্ষে পাঁচটা পরিবারের কাছ থেকে। কয়েকজন সাধু ব্যতীত, এই ভিক্ষা করার অভ্যাস অনেকটা হারিয়ে গেছে বা আধুনিক রূপ ধারণ করেছে — যেমন বিকাশের মাধ্যমে (মোবাইল ফোন চালিত ব্যাংকিং হিসাবে) সুদূরবাসি ভক্তের দান করা টাকা দিয়ে বাজার করা হয়।

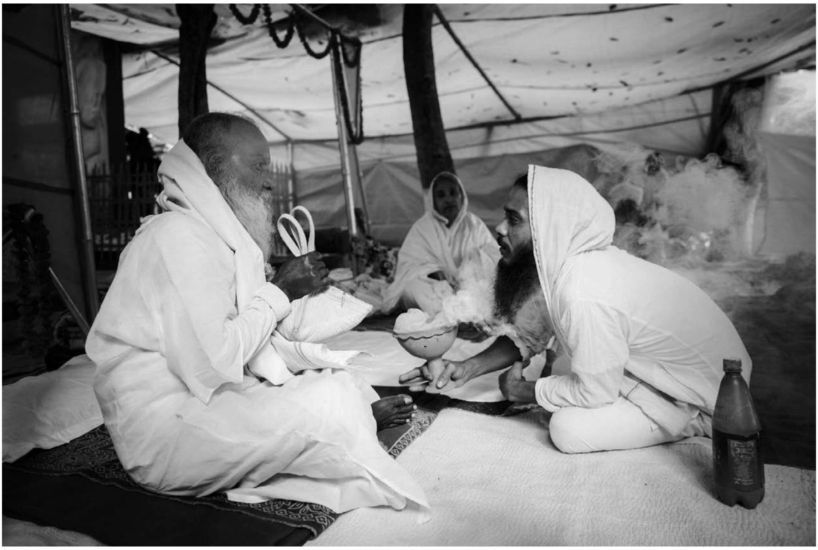

গুরু নহির শাহকে ধুপধুনা দিয়ে ভক্তি অর্পণ করছেন রাজন ফকির

এখানে হয়তো আমাদের গুরুর কূলে ব্যতিক্রমী একটা অভ্যাস হয়েছে, এ কথা বলে রাখা ভালো। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের গুরু যখন তাঁর আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন প্রাগপুর গ্রামে তখন তাঁর গুরুর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন শুধু নিরামিষ খ্যাদাভ্যাস বারোমাসে পালন করার। তার মানে আমাদের সাধুসঙ্গে শুধু মাংস ও ডিম নয়; মাছ, পেয়াজ, রসুন, মসুরি ডাল, মিষ্টি কুমড়ো চলে না। ব্যক্তিগত রুচির বাহিরে সাধুসঙ্গের এই অভ্যাসের পেছনে একটা যুক্তি আছে। এই যুক্তি হচ্ছে যে, যদি কোনো অতিথি সাধুসঙ্গে এসে একটাই সেবা গ্রহণ করতে না পারে তার ফলে আয়োজককে কঠিন একটা শাস্তি দেওয়া হয়; অর্থাৎ তখনই আগত সাধুগুরু বিদায় নেয়, সকাল সকাল উঠে তার আস্তানা ত্যাগ করে, হেঁটে যতদূরে সে পৌঁছাবে সেইখানে নতুন করে তাকে অবস্থান করার ব্যবস্থা শুরু করতে হবে...।

নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে সাধুসঙ্গের সেবার তালিকা ও তার সাধারণ আইটেম:

সন্ধ্যার মুড়ি সেবা: মুড়ি; মুড়কি (মিষ্টি মাখানো); কাঁচা মরিচ, চানাচুর, সরিষা তেল, হয়তো ধনে পাতা (ঝাল মাখানো); লাল চা (মসলা দিয়ে তৈরি, মিষ্টি ও চিনি ছাড়া দুটি ব্যবস্থা রাখা ভালো)।

অধিবাস সেবা: ভাত (রুটির ব্যবস্থা রাখা ভালো), ডাল, তরকারী, (লবণ), অন্যান্য।

গোষ্ঠ মুড়ি: খুবই হাল্কা তেল, লবণ ও মরিচ দিয়ে মাখানো।

বাল্য সেবা: চিঁড়া, মুড়ি, মুড়কি, দই (মিষ্টি ও টক), কিংবা পায়েস; ফল (কমপক্ষে কলা), মিষ্টি, লবণ। একটা নুন ব্যবস্থা রাখা ভালো।

পূর্ণ সেবা: ভাতের সাথে পঞ্চতত্ত্বের উৎসর্গে পাঁচটা আইটেম, যেমন— ডাল, ভাজি, শাক, ঝোল তরকারি, স্যালাড, (লবণ), অন্যান্য।

সেবা পরিবেশনের নিয়ম পরে বর্ণনা করব। এখানে শুধু লিখে রাখলাম সেবার ব্যবস্থার নিয়ম। গুরু সেবায় কোনো বাসি খাবার চলে না। তাই, যতসম্ভব ভিক্ষা করা টাটকা সবজি, চাল, ডাল, তেল, লবণ। এক কথায়, যা কিছু লাগে এই সাধুসেবার উদ্দেশ্যে যেন আনা হয়, এই সব দিয়ে রান্না-বান্না করা হবে। গুরু মানে প্রভু। যেহেতু প্রভুর উদ্দেশ্যে এই সেবাটি ব্যবস্থা করা হয়, সেইহেতু যারা বাবুর্চি বা সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবে, তাদের কোনো নিবেদন করা হবে না — মুখে বা নাকে হোক, অর্থাৎ কাজের মধ্যে স্বাদ বা ঘ্রাণ তারা গ্রহণ করবে না। আদর্শ পরিবেশ বা পরিস্থিতি জুটতে পারলে, এই রান্না-বান্না নীরবে করা হয়, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা ভরা ধ্যানে। তাই, শব্দ হবে না খাবারে নড়তে, শব্দ হবে না মুখে। কয়েক জন দিব্য বা সুক্ষ জ্ঞানী ফকিরের গল্প শুনেছি, যাঁরা ধরতে পারতেন— বাবুর্চির মন সঠিকভাবে তার কাজে বসে ছিল কি না, মাত্র সেবাটি তাঁদের সামনে দিতে না দিতে। মুখের স্বাদ চাইতে, মনের তৃপ্তির দাম বেশি, এবং এই তৃপ্তি ঘটতে পারে শুধু মনের গুণে। এই রান্না-বান্না করা হয় গুরুর নাম ধরে, স্বরূপে ডুবে, প্রেমময় বিবেক দিয়ে — আর অবশ্য অভিজ্ঞতার উপরে।

ক.৪/ অন্যান্য ব্যবস্থা — ঘট, মালসা, আসন, বাদ্যযন্ত্র

সেবার সঙ্গে জড়িত কিছু জিনিস-পত্র ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন পরিবেশ তৈরি করতে কাঁথা পাড়া লাগবে, আঁচলা-ধারী সাধুগুরুর জন্যে আসন কাঁথা ও বালিস। রান্না-বান্না করতে সুস্পেন্ডার, হাড়ি-পাতিল লাগবে। সেবা পরিবেশন করতে থালা বা কলার পাতা, চামচ প্রভৃতি লাগে। যেন কম-বেশি আরামে সাধুগুরু ও ভক্তবৃন্দ ২৪ ঘণ্টা সময় কাটাতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী বিবেচনা করা হয়।

থাকার ব্যবস্থা ও খাদ্য সেবা ছাড়াও আরও কিছু বস্তু প্রস্তুত রাখতে হয়। যেমন—মূল আসনের জন্যে ফুল, ফল, নতুন কাপড় বা গামছা, মাটির ঘট ও মালসা, মোমবাতি, আগরবাতি, ধূপ, ধূপচি ও নারকেলের ছোবড়া, ম্যাচ, পান, সুপারি, মিষ্টি, তুলসী পাতা, আমের পাতা প্রভৃতি। কিন্তু আসনটার অর্থ কী? ঘট ও মালসা তৈরি করার কায়দা কী? পরবর্তী অংশে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করব।

সংগীত আসর বা বাণী উপস্থাপনার জন্য বাদ্যযন্ত্র লাগে। প্রাথমিকভাবে একটা একতারা, দোতারা, আখড়ার ডুগী, প্রেম জুড়ি (কাঠ-করতাল), মন্দিরা; সাধারণ্যে এই তালিকার সঙ্গে থাকে একটা হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলা।

এই অংশটি পাঠ করে পাঠকদের মোটামুটি একটা ধারণা এসে গেছে যে, সাধুসঙ্গের অনুমান বা অগ্রিম প্রস্তুতি কোন প্রকার বা কোথায় দাঁড়ায়। আমাদের গুরু বলেন যে, প্রত্যেকটা সাধুসঙ্গে বড় একটা ভুল করা হয়, তাতে শিক্ষার ও বিকাশ হওয়ার সুযোগও তৈরি হয়। তাই এই অপূর্ণ তালিকা মনে রেখে, এখন সাধুসঙ্গের সময় সূচির ক্রমানুযায়ী একটা বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

খ/ 'ভজো রে আনন্দের গৌরাঙ্গ' — প্রথম চার প্রহর মিলে একটা আগমন

আমাদের গুরুর গল্পে জানা যায়, এক সময় সাধুসঙ্গ শুরু হতো গভীর রাতে ৬-১০ জন সাধুকে নিয়ে। এত নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা লাগত না। প্রবীণ বিজ্ঞ ও দিব্যজ্ঞানী সাধুর উপস্থিতিতে কৃপার উপরে সাধুসঙ্গ হয়ে যেত। লালন সাঁইয়ের ঘরের ফকির ঝড়ু শাহ্, ফকির খোদাবক্স সাঁই, আমাদের গুরুর গুরু ফকির লবান শাহ্, ফকির সাধন শাহ্, ফকির

মকছেদ আলী সাঁই; দেলবার শাহের ঘরের ফকির বেহাল শাহ্, ফকির রিয়াজ শাহ্, মাওলা বক্স শাহ্; সতী মার ঘরের ফকির আতাহার শাহ্; পাঞ্জু শাহের ঘরের মোজাম শাহ্ শুধু ডুগী ও একতারা হাতে নিয়ে (কোনো মাইকিং ছাড়াই) শত শত সুধীমণ্ডলিকে মুগ্ধতায় ধরে রাখতেন। তাঁদের এই শক্তিতে এবং সাধারণ মানুষের ভয়-ভক্তিতে সাধুসঙ্গের মূল দাম বা লক্ষ্য প্রমাণিত হতো। লালন সাঁইয়ের নামে প্রচলিত এই জনপ্রিয় বাণীটি শিরোনামে রেখে এখানে গানটি সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করলাম, ভাবটি বুঝাতে।

ভজো রে আনন্দের গৌরাঙ্গ।
যদি ত্বরিতে বাসনা থাকে, ধর রে সাধুসঙ্গ॥

সাধুর গুণ যায় না বলা, শুদ্ধ চিত্ত অন্তর খোলা।
সাধুর দরশনে যায় মনের ময়লা, পরশিলে প্রেম তরঙ্গ॥

সাধু জনার প্রেম হিল্লোলে, কত মাণিক-মুক্তা ফলে।
সাধু যারে দয়া করে, প্রেমময়ী দেয় প্রেম অঙ্গ॥

এক রসে হয় প্রতিবাদী, এক রসে ঘুরছে নদী।
এক রসে নৃত্য করে, নিত্য রসের গৌরাঙ্গ॥

সাধুর সঙ্গগুণে রঙ ধরিবে, পূর্ব সঙ্গ দূরে যাবে।
ফকির লালন বলে, পাইবে প্রাণের গোবিন্দ, করো রে সত্যের সঙ্গ॥

দিনে দিনে একতা ও শৃঙ্খলা তৈরি করার লক্ষ্যে আমাদের গুরুর গুরু লবান শাহের পরিকল্পনাতে দীর্ঘদিন যাবত লালন সাঁইয়ের ভাবমূর্তি ও আদর্শ হজম করে বিশেষভাবে আলাদা একটা রূপ গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এই আদর্শ রূপ চালু আছে চারটি আখড়াতে— ১. ফকির লবান শাহের জ্যোতিধাম, খলিশাকুন্ডিতে, যেখানে সাধুসঙ্গ আয়োজিত হয় বছরে দুই বার, গুরু বার্ষিকী ও তিরোধান দিবসের উপলক্ষ্যে; ২. আমাদের গুরুর হেম আশ্রম, প্রাগপুরে, যেখানে আমাদের দুইজন গুরুমায়ের তিরোধান দিবস একই দিনে হওয়ার কারণে, ৪৮ ঘণ্টা ধরে সাধুগুরুকে রাখা হয় ফাল্গুন মাসে; ৩. আমাদের গুরুর গুরুভাই ফকির মহরম শাহের আরশি নগর, আদা বাড়িয়ায়, তাঁর স্ত্রীর তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে; এবং ৪. আমাদের গুরুর মেয়ের আখড়াতে, আনন্দ ধামে, পাককোলায়, যেখানে জানুয়ারি মাসে আমাদের গুরুর জামাই ফকির শামছুল শাহের গুরু বার্ষিকীর উপলক্ষ্য সাধুসঙ্গ আয়োজিত হয়, এবং ২০২২ সাল থেকে সম্ভবত রঞ্জনা ফকিরানির তিরোধান দিবসে আরেকটা সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই চারটি জায়গার বাহিরে কি রুচির সঙ্কটে কি মনের দ্বিধায় কি পরিবেশের অভাবে পূর্ণভাবে দাদা গুরুর নিয়ম-বিধান বা রীতিনীতি তেমনভাবে পালন করা হয় না।

খ.১/ প্রথম প্রহর — স্বাগতে সৃষ্টি

সাধুগুরু বলেন যে, একটা সাধুসঙ্গের মাধ্যমে অদৃশ্য একজনকে সৃষ্টি বা জোর করে উপস্থিত করা হয়— যার নাম গৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য। প্রভুর প্রকাশিত রূপ প্রাণ।

প্রভুর আগমনের জন্যে চাল-জল (সর্বসৃষ্টির পঞ্চতত্ত্ব রূপক) ও ধূপ দিয়ে সাধুগুরুর আসন গ্রহণ করা হয়। সাধুসঙ্গের প্রধান সভাপতির সামনে একটা ছোট চকি বসানো হয়— যাকে মূল আসন বলা হয়, সেটাকেই প্রভুরই আসন ভাবা হয়। এই আসনে অধিবাসের সময় পঞ্চঘরের নামে পাঁচটা ঘট ও পাঁচটা ফুলের মালসা বসানো হয়। একটা নতুন কাপড় বা গামছায় আড়াল করে ঘটের উপাদান হিসেবে আতপ চাল, সিদ্ধ করা চাল, পাঁচ প্রকার শুকনো মিষ্টি, পাঁচ প্রকার ফল, পাঁচটা পানের পাতা, পাঁচটা কাঁচা সুপারি, পাঁচটা তুলসী পাতা রাখা হয়। মালসা সাজানো হয় পাঁচ প্রকার পাতা ও পাঁচ প্রকার ফুল দিয়ে। পাঁচজন আঁচলা-ধারী সাধিকা, ঘট ও মালসা একটা নারকেলসহ মাথায় নিয়ে ভক্তি দিয়ে প্রভুর আসনে বসাতে আসে। 'আল্লাহ্ আলেক' ডেকে সাধুর বাদ্যযন্ত্রের আখড়া শুনিয়ে ও গোলাপ জল ছিটিয়ে এই আসনে ২৪ ঘণ্টা ধরে একটা মোমবাতি জ্বালানো হয়। একই আগুনে মোমবাতি জ্বলতে থাকবে— আগুনের রূপে প্রভু, যার রঙ কালো। এই আগুনের সাথে আগরবাতি জ্বলতে থাকবে, পাঁচটা করে, পঞ্চভূতের পবিত্রতার একটা প্রতীক হিসেবে। এই আগমনের পরে চারটা বিশেষ বাণীর উপস্থাপন শুরু হয়। প্রথমে সবাই মিলে বসে বসে লালন সাঁইয়ের দুটি আবেদনমূলক দৈন্য গান বলে প্রভুকে ডাকে— 'কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারি' ও 'কোথায় রইলে হে দয়াল কাণ্ডারি'। যে-কথাগুলো বলা হয় আমাদের গুরুর কুলে প্রায় দেখা যায় বইয়ের লেখার চেয়ে তাতে কিছু পার্থক্য থাকে। এই কারণে নিচে তাদের রূপ লিখে রাখলাম।

কোথায় হে দয়াল কান্ডারি।
এই ভব তরঙ্গ এসে, কিনারাই লাগাও তরী॥

তুমি হও করুণা সিন্ধু, (ওরে দয়াল) অধম জনার বন্ধু।
দাও হে এসে পদ বিন্দু, যাতে তুফান ত্বরিতে পারি॥

পতিত যদি না ত্বরাবে, (ওরে দয়াল) অধম তারণ নাম কে লবে।
জীবের দাঁড়ায় ইহাই হবে, নামের ভেরম যাবে তোমারই॥

ডুবায়ো, ভাসায়ো, হাতটি তোমার, (ওরে দয়াল) এই জগতে কেউ নাই আমার।
লালন বলে দোহাই তোমার, তোমার চরণে ঠাঁই দাও হরি॥

এবং

কোথায় রইলে হে, দয়াল কান্ডারি।
এই ভব তরঙ্গ মাঝে, দয়াল দাও এসে চরণ তরী॥

যতই করি অপরাধ, (ওরে দয়াল) তথাপিও তুমি নাথ।
মারিলে মরি নিতান্ত, দয়াল বাঁচাইলে বাঁচতে পারি॥

পাপীকে করিতে তারণ, (ওরে দয়াল) নাম ধরেছ পতিত পাবন।
ঐ ভরশায় আছি যেমন, চাতক মেঘ নিহারী॥

সকলেরই নিলে পারে, দয়াল আমারে চাইলে না ফিরে।
লালন বলে এই সংসারে, দয়াল আমি কি তোর এতই ভারী॥

এই দুটি আবেদনের উত্তরে সবচেয়ে প্রবীণ সাধুর একজনই দাঁড়াবে এবং লালন সাঁইয়ের বিখ্যাত প্রবর্ত গান 'সময় গেলে সাধন হবে না' পরিবেশন করবে। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, সাধারণ শিল্পীদের কথার থেকে সাধুগুরুদের গাওয়াতে কিছু পার্থক্য থাকে।

সময় গেলে সাধন হবে না।
দিন থাকিতে, তিনের সাধন কেন করলে না॥

জানো না মন, খালে-বিলে থাকে না মীন জল শুকালে।
কি হবে আর, বাঁধাল দিলে, মোহনা শুকনা॥

অসময়ে কৃষি করে, মিছামিছি খেটে মরে।
গাছ যদি হয় বীজের জোরে, তাতে ফল তো ধরেনা॥

অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়, মহাজন সেই দিনে উদয়।
লালন বলে তাহার সময়, দণ্ডেক রয় না॥

সাধুসঙ্গে দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিয়ে সংগীত পরিবেশনের দৃশ্য

এই বাণী দিয়ে দৈন্য পদে যে আবেদন করা হয়েছিল, তাদের উত্তরে একটা যোগ তৈরি হলো। তাই তখন আসল আগমনের বাণী বলা হয়। এই আগমনের জন্য সব উপস্থিত সাধুগুরু ও ভক্তবৃন্দ উঠে দাঁড়ায়। হাতের তালি, নাচ ও সবার সমবেত কণ্ঠে তখন আলাদা একটা ভাব ফুটে উঠে।

এসো হে শ্রী গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ সঙ্গে করি।
মনের আনন্দেতে তোমার সনে, সংকীর্তনে নৃত্য করি॥

(গৌর হে) নদের চাঁদ নদে ছেড়ে, উদয় হও মোর হৃদ মন্দিরে।
তোমার চাঁদ গৌর রূপ চক্ষে হেরে, মানব জনম সফল করি॥

(গৌর হে) ভুবন মোহন গোরা, ত্রিজগতের মনোহরা।
রাধা প্রেমে মাতোয়ারা, ধূলায় দিচ্ছে গড়াগড়ি॥

(গৌর হে) যে ডাকেরে বারে বারে, ভয় কি রে তার ভব পারে।
দ্বিজ ভূষণ বলে অন্তিম কালে, পায় যেন গো চরণ তরী॥

এই আগমনের বাণী সোজাভাবে বলা হয় না। অন্তরাগুলো নানান সুরে বলা হয়, প্রশ্নোত্তর রূপে। বাণীর কথার শেষে, ভাবটি আরও গাঢ় বা তীব্র করার জন্যে একেবারে বন্ধ না করে বাদ্যযন্ত্র ও সুর দিয়ে ঝাঝের তাল নিয়ে, 'গুরু বল' বারংবার বলা হয়। আবার গোলাপ জল ছিটিয়ে, এই উত্তেজনার সমাধানে সবাই সেজদা হয়ে পড়ে, ভক্তিময় ভাব ধরে। এর পরে বাতাসা প্রসাদ বিতরণ করা হয় সবারই হাতে।

খ.২/ দ্বিতীয় প্রহর — ভক্তি, দৈন্য

শ্রী চৈতন্যের সর্বজনীন ভক্তি-ভিত্তিক আন্দোলন, সুফি মতবাদে মুর্শিদের কদমে আত্মসমর্পণ হওয়ার নীতির সাথে মিল পেয়েছিল এই বঙ্গের গ্রাম্যাঞ্চলে। মরমীয়াবাদীর সমন্বয় শক্তি দিয়ে তৈরি হয় এই বাউল-ফকির পথ-মত, শত লৌকিকধর্মের মধ্যে বর্তমান যুগে মাত্র একটাই উদাহরণ জীবিত দেখা যায়। যেমন ফকির পাঞ্জু শাহের জীবনী পড়লে বোঝা যায়, নিয়মিতভাবে গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব গুরু ও সুফি মুর্শিদ একত্রিত হয়ে ধার্মিক কথোপকথন ও পালা গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকাশিত করতেন, তেমনি লালন সাঁইয়ের বাণীর মধ্যে এই দুটো ধারার প্রভাব পাওয়া যায়, নিঃসন্দেহে। ভক্তি, নামাজ, সেজদা, যে নাম ব্যবহার করা হোক না কেন, সন্ধ্যায় মাগরিবের সময় ধূপ দিয়ে সাধুগুরুকে পূজনীয় মনে করে দীক্ষা মন্ত্র বলে চাল-জল নিবেদনে এই বিশেষ ভক্তির সময় দিয়ে সাধুসঙ্গের গতিবেগ বাড়ানোর কাজ শুরু হয়। যেমন শ্রেণি বুঝে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, এখানেও সাধুগুরুর শ্রেণি বুঝে ভক্তবৃন্দ আপন গুরুর কদম বুচি করতে পরে, সাধুগুরুর চরণধূলি হাতে ও মুখে ছুঁতে যায়। কাজটি সম্পূর্ণ হয় 'জয় জয় সাধুগুরু বৈষ্ণব' ডাক দিয়ে, সুফি মতবাদে যেটা অজিফা বলা হয়, সেটা বাস্তবায়ন করা হয় সকলের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে নিজ আসনে বসে বসে চারটি দৈন্য বাণীর মাধ্যমে, শুধু হাতের তালি দিয়ে। এই চারটি বাণী হল 'গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার লও গো সুপথে', 'গুরু সুভাব দাও আমার মনে', 'গুরু আমারে কি রাখবেন তোমার চরণ দাসী' ও 'গুরু তুমি পতিত পাবন পরম ঈশ্বর'। যেভাবে আমাদের গুরুকূলে এই চারটি বাণী আদিসুরে বলা হয়, সেই ভাবে নিচে লিখে রাখলাম।

গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার লও গো সুপথে।
তোমার দোয়া না হইলে, চরণ সাধি কি মতে॥

তুমি যার হও গো সদয়, সে তোমারে সাধনে পায়।
দেহের বিবাদী স্ববশে রয়, তোমার কৃপাতে॥

যন্ত্রের যন্ত্রী যেমন, বাজায় যন্ত্র, বাজে তেমন।
অমনি যন্ত্র আমার এ মন, বল তোমার হাতে॥

জগাই মাধাই দস্যু ছিল, তাহে প্রভুর দয়া হলো।
ফকির লালন পথে পড়ে রইল, তোমার আশাতে॥

এর পরে:

গুরু সুভাব দাও আমার মনে।
তোমার চরণ যেন ভুলি নে॥

তুমি নিদয় যাহার প্রতি, তাহার সদায় ঘটে কুমতি।
তুমি মনোরথের সারথী, যথা লও যাই সেইখানে॥

তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী,
তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী গুরু, না বাজাও বাজবে কেনে॥

জন্ম অন্ধ মন নয়ন, তুমি বৈদ্য/বৌদ্ধ সচেতন।
ও তাই বিনয় করে বলছে লালন, জ্ঞান অঞ্জন দাও নয়নে॥

তৃতীয় ধাপে:

গুরু আমারে কি রাখবেন তোমার চরণ দাসী।
ইতরপনা স্বভাব আমার, ঘটে রে অহর্নিশি॥

জঠর যন্ত্রণা পেয়ে এসেছি মন করার দিয়ে।
সে সকল গিয়েছি ভুলে ভবেতে আসি॥

চিনলাম না মন গুরু কি ধন, করলাম না তার সেবা-পূজন।
ঘুরতে বুঝি হল রে মন, জনম চৌরাশী॥

গুরু যার আছে রে সদয়, শমন বলে তার কিসে ভয়।
ফকির লালন বলে মন তুই আমায় করলি রে দূষী॥

সর্বশেষের গানটি এবার উল্লেখ করতে পারি। যদিও গবেষকদের সন্দেহ থাকে যে, এই বাণীটি সাঁইয়েরই রচনা কি না, বা অন্য জনার রচনা; যদিও জায়গায় জায়গায় সিরাজ শাহের পরিবর্তে মলম শাহের নাম শোনা যায়।

গুরু তুমি পতিত পাবন পরম ঈশ্বর।
অখণ্ড মণ্ডল আকারং, ব্যক্তং জগতং চরাচর॥

ভজে যদি না পাই তোমায়, এই দোষ আমি দেব বা কার।
দুটি নয়ন আছে তোমার উপর, যা করো তুমি এই বার॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনে, তোমায় ভজে নিশিদিনে।
জানি নে আর তোমা বিনে, তুমি গুরু পরাৎপর॥

আমি লালন একই শিঁড়ে, ভাই-বন্ধু নাই আমার জোড়ে।
ভুগেছিলাম পক্সজ্বরে, দরবেশ সিরাজ সাঁই করেন উদ্ধার॥

এই চারটি বাণী বলা সকল ভক্তবৃন্দের নিত্য একটা অভ্যাস থাকার কথা, সন্ধ্যার গুরুকর্ম করার পরে। সাধুসঙ্গে এই পরিবেশন করার পরে একটা বিরতি নেওয়া হয়। কেউ এখানে চা খাওয়ায়।

খ.৩/ তৃতীয় প্রহর — দীন ডাকা, মুড়ি সেবা, সংগীত আসর

প্রথমে যখন বাংলা ভাষা শেখার শুরু করি তখন এই দীন শব্দে ধর্ম না বুঝে, দিন-রাত বুঝতাম। এই ভুল বোঝা একদিন সমাধান হল 'আলেক ডাকা' নামে যখন এই প্রহরের প্রবেশকে বুঝানো হলো। 'আল্লাহ্ আলেক'-এর মানে হলো, আল্লাহ্ বা প্রভু বর্তমানে উপস্থিত। এই ডাকের আর একটা রূপ 'আলেক সাঁই'। যেকোনো কাজের শুরুতে, ভক্তি হোক, সেবা পরিবেশন করা হোক, সেবা গ্রহণ করা হোক, আখড়া বাজান হোক, মঞ্চের উদ্বোধন হোক, এই ডাক দিয়ে একটা কাজের পবিত্র গুণ বাস্তবায়ন করা হয়।

এশার নামাজের সময় সাধুসঙ্গের গতিবেগ উচ্চ যখন হতে যাচ্ছে তখন এই দ্বীন ডাকা দিয়ে গুরুর গুরুর উদ্দেশ্যে 'পূর্ণ পাত্র' নামে আর একটা ঘট ও ফুলের মালসা আনা হয়, নারকেলসহ, একজন খেলাফত প্রাপ্ত সাধিকার মাথায়। এর সঙ্গে ষষ্ঠ ঘট, মালসা আর একটা নারকেল আনান হয় একই নিয়মে। এবং পাঁচটা আগরবাতি ও পাঁচটা মোমবাতি জ্বালানো হয় মূল আসনের পাশে। নিজ জায়গায় বসে, গুরু কর্ম করে, সাধুগুরু 'আল্লাহ্ আলেক' ও 'জয় জয় সাধুগুরু বৈষ্ণব সর্ব চরণে', এই নতুন প্রহর স্বাগত জানায়। এর পরে, সাধারণ্যে একটা মুড়ি সেবা দেওয়া হয় — তাতে সভাপতির উদ্দেশ্যে প্রথম বারের মত পারশ দেওয়া হয়। পারশের অর্থ, সেবার পরিবেশন ও নিবেদনের নিয়ম নিয়ে পরবর্তী অংশে বর্ণনা করা আছে। এই বিষয়টি আলাদা করে একটা বিভাগে রাখা হলো। তার কারণ হচ্ছে, সেবা সাধুসঙ্গের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। এই মুড়ি সেবার পরে, অনেকে চা পরিবেশন করে, চিনি দিয়ে ও চিনি বিনে—দুই প্রকারে, নিবেদকের রুচি বা প্রয়োজন অনুযায়ী।

এর পরে মঞ্চের উদ্বোধন করা হয় ও সংগীত আসর শুরু হয়। দুই-তিনটা বাণী উপস্থাপনা করার মধ্যে চাউল পারশ নামে চাউল-ভরা গামলা, আগরবাতিসহ, নতুন গামছায় আড়ালে, ঘুরানো হয়, প্রথমে সভাপতির কাছে, এর পরে ভিন্ন ঘরের সাধুর কাছে, এর পরে বাকি সব অতিথিদের কাছে। গামছার আড়ালে এই চাউলে হাত ঢুকিয়ে, ভক্তি দিয়ে একটা দোয়া বা প্রার্থনা করা হয় মনে মনে, এবং দক্ষিণা দেওয়া হয়, ইচ্ছার মতন — কেউ দশ টাকা, কেউ পাঁচশ' টাকা। আমরা এই চাউল পারশ নিয়ে নতুন একটা নিয়ম আবিষ্কার করে এনেছি: যার কোলে চাউল-পারশ ঘুরবে সে এই নতুন গামছা বা কাপড় পাবে। ঘোরার পরে এই চাউলে অধিবাসের সেবার ভাত রাঁধা হয়। যদিও এই রকম অসাধু কাজ দেখেছি, কিন্তু কোনো মতেই এই চাউল মুখে দিতে নেই!

বর্তমান যুগে বড় সাধুসঙ্গে গেলে দেখা যায় যে, মান-সম্মান দেখাতে সাধুগুরু ও শিল্পী সবাইকে গান বলার সুযোগ দেওয়া লাগে। তাই, বাণীর পালা বা বাণীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আলোচনা করার সুযোগ ঘটে না। বরং ছোট সাধুসঙ্গে গেলে, তখন গভীর দৈন্য-প্রবর্ত আলাপন বা গুরুশিষ্য ভাব-বিনিময়ের মজা ঘটতে পারে, বিশেষ চর্চা বা দর্শনের দফা নিয়ে। এই প্রবন্ধ লিখার দুএক সপ্তাহ আগে, একটা সাধুসঙ্গে উপস্থিত হওয়ার ভাগ্য হয়েছে আমার, যেখানে এই রকম রাগ ধরল সাধুগুরুকে, রাত ১১টার দিকে... বাণীর মাধ্যমে, এই কথাপকথন শুরু হলো জীবাত্মার দশা নিয়ে। আমাদের

গুরুর একজন গুরুভাই লালন সাঁইয়ের ‘জীব ম’লে জীব যায় কোন সংসারে’ বলল। এই বাণীর উত্তরে এলো ‘জীব মরলে যায় জীবান্তরে’। এখান থেকে আদেশ-উপদেশ দেওয়া হলো দৈন্য-প্রবর্তের মাধ্যমে, দুই ঘণ্টা ধরে, হয়তো তার আরও বেশি। তখন সাধুগুরুর বাণীর মূল উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায় — বিনোদন নয়, গভীর শিক্ষামূলক আনন্দ, রাগ-অনুরাগ বা ভাব। কেননা, সাধুগুরু বলেন যে, একই কথা সাধারণ গলায় বললে একটা কানে ঢুকে আর একটা কান দিয়ে দূরে উড়ে যাবে, বরং সুরের সঙ্গে যখন এই কথাটি তাল ও লয় দিয়ে বলা হয়, অর্থাৎ তাকে যখন অসাধারণ স্তরে বিবেচিত করা হয় তখন এই কথাগুলো হৃদে ঢুকে, স্থায়ীভাবে৷৷

খ.৪/ চতুর্থ প্রহর — অধিবাস সেবা

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে, সাধু সেবার রান্না-বান্নার নিয়ম বর্ণনা করেছি। এখন পরিবেশনের নিয়ম বর্ণনা করতে যাচ্ছি। সাধুসঙ্গ, পূজার একটা রূপ ধারণ করে, পারশ ও প্রসাদের কথা যদি বলি। পারশের মানে হলো, যা কিছু নিয়ে একটা সেবা পরিবেশন করা হবে, সেটা সব কিছুই একটা বড় থালায় সেজে ঢেকে রেখে, গুরু দক্ষিণা ও লবণসহ, আয়োজক এই পারশের থালা মাথায় নেয়। আয়োজকের পেছনে, যৌক্তিক সিরিয়াল ধরে, কালান্দার যারা, তারাও কেউ একটা গামলা, কেউ একটা বালতি, কেউ একটা পাতিল, কেউ বাধ্যতামূলক লবণের থালা, মাথার উপরে ধরে, সাধুগুরুর সামনে আসে, ‘আল্লাহ্ আলেক’ তিন বার ডেকে। পারশ থালাটি কঠোর ভক্তি দিয়ে গুরুর আসনে পৌঁছান হয়, ভক্ত কপাল যেন থালার আগে মাটি স্পর্শ করে সেইভাবে। যারা পরিবেশন বা কালান্দারি করে, তাদের মাথায় একটা কাপড়, গামছা বা ওড়না থাকবেই। এবং তাদের পরিবেশনে কারো থালায় স্পর্শ করবে না — হাত হোক বা চামচ হোক। পারশ পৌঁছিয়ে, ঘরের সাধুর কাছে শুরু করে সেবাটির পরিবেশন করা হয়, শ্রেণি বুঝে।

যখন সবারই থালাতে (বা মুড়ি সেবার ক্ষেত্রে, গামছায়) এই সেবা সম্পূর্ণভাবে পৌঁছে গেছে তখন ধূপ দিয়ে পারশের ঢাকনা বা সরপোশ তোলা হয়, এবং যারা পরিবেশন করেছেন, তারা সেজদা হয়ে ‘আল্লাহ্ আলেক’ তিন বার ডাক গ্রহণ করে। এর পরে, দাঁড়িয়ে, সাধুর সেবা গ্রহণ করার একটা হুকুম সবারই উদ্দেশ্যে বলে: ‘সাঁইজি সেবা নেন; সাধুগুরু আপনারা সবাই সেবা নেন’। সাধুসঙ্গের সভাপতি সর্বপ্রথম এই সেবার আয়োজন মুখে নিবেন। এর পরে, বাকি সবাই তাদের থালায় হাত দিবে, সেবাটি গ্রহণ করতে। সেবা পরিবেশনের মধ্যে, নিজ থালায় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। কোনো লেনাদেনা করা যাবে না। আদর্শে নীরবে সেবা গ্রহণ করতে হয়, স্বরূপে ডুবে। তার কারণ হলো, সেবার মানে যদি ইবাদতই হয়, তাহলে এই সেবার মাধ্যমে নিজ অন্তরে যে প্রভু বিরাজ করে, তাঁর উদ্দেশ্যে এই সেবাটি গ্রহণ করা হয় — পেট ভরানোর জন্য নয়। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যে সেবা গ্রহণ করছে তার হাত এই সেবার পরিবেশনে যেতে পারবে না — কোনো কিছুই প্রয়োজন হয়ে পড়লে, গ্রাহক একজন কালান্দারিকে জানাতে পারে, যেন তার কাছে আনান হয়। সেবা গ্রহণ করার শুরু থেকে, হাত না ধোয়ার পর্যন্ত, নিজের সেবার ব্যতীত, গ্রাহকের হাত কোনো কিছু স্পর্শ করবে না। সহজ কথায়: যে দেয়, সে নিতে পারবে না; যে নেয়, সে দিতে পারবে না। এই সেবা গ্রহণ করার শেষে, পারশের থালায় আবার সরপোশ দিয়ে ঢেকে,

আয়োজক তার গুরুর সামনে ভক্তি হয়ে, এই প্রসাদ বুকে নিয়ে তুলে দেয় ও চলে যায়। এর পরে হাত ধোয়া হয়। তখন সেবাটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আরও স্পষ্টভাবে বললে, পারশ গঠন করা হয় গুরুর কাছে পৌঁছাতে, এবং গুরুর নিবেদনের পরে যতটুকু বাকি থাকে, সেটা প্রসাদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে তোলা হয় আর ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সাধুগুরুর সঙ্গে বসে যারা এই সেবা নিবেদন করতে পারেনি, তারা এই সেবা গ্রহণ করতে যায় অন্য জায়গাতে। এখানে আর কোন নিয়ম পালন করা হয় না — তবে ভদ্রতা বা সভ্যতা ভজায় রাখতে, কেউ না কেউ কারো অপেক্ষায় থাকতে পারে।

এখানে আর একটা কথা। ফকিরের দরশনে, আত্মশক্তি নিজের কাছে রাখতে হয় শক্তিটি দৃঢ় ও গাঢ় করতে — অর্থাৎ অন্য স্তরে, নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্র নিজের কাছে রাখা সেরা। দেখা যাচ্ছে যে সাধুসঙ্গে গেলে সাধুগুরু নিজের থালা, জলপাত্র, কম্বল, কেউ না কেউ নিজের আসনের কাঁথা নিয়ে আসে। তাই, হাত ধোয়ার সময় অনেকে নিজ আসনে বসে নিজের থালা ধুয়ে নেয়, লবণ ও জল দিয়ে। এই নিয়মটি, নিজের থালা না হলেও ভক্তবৃন্দ পালন করে থাকে — অর্থাৎ যে থালা সেবা গ্রহণ করা হয়েছে, ফেরত যেন পাঠান হয় একইভাবে, নিজ জায়গায় বসে বসে যতটুকু পরিষ্কার করা সম্ভব ততটুকু করে নিয়ে। বিষয়টি এখানে শুধু ভদ্রতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নয়। ফকির ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে, যতটুকু পারি ততকম চিহ্ন রাখব আমার পায়ের চাপে এই দীন দুনিয়ায়। হৃদে সত্যি যদি প্রভুর সাথে বিলীন হওয়ার বাসনা থাকে, তাহলে তাঁরই চিহ্ন রেখে যাব, নিজের ব্যক্তিগত চিহ্ন নয়। তাই, সব কর্মের মাধ্যমে, এই অঙ্গীকার বা নিয়ত প্রকাশ যেন পায়, সেইভাবে চলা সেরা॥

গ/ 'নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে, আকারে সাকার রূপ ধরে সে' — সাধুসঙ্গের সৃষ্টির পূর্ণতা

সাধুসঙ্গ মানে সাধুগুরুর ব্যক্তিগত সত্ত্বার একত্রিত শক্তি দিয়ে একজনকে সৃষ্টি করা — যোগ দর্শন অনুযায়ে। যেটা ইংরেজি ভাষায় 'egregore' নামে চেনা। মোমবাতির যে আগুন জ্বলে থাকে প্রধান আসনে, এই সৃষ্টির প্রাণ প্রতীক হিসেবে জ্বলে। তাঁর আগমনের জন্য বিকেলে অধিবাস, সন্ধ্যা ভক্তি, সংগীত আসর ও রাতের সেবা পার করলাম ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে। রাত যখন দিন হয়ে যায়, অর্থাৎ অন্ধকার থেকে রবির আলো যখন প্রকাশ পায়, তখন এই শ্রেষ্ঠ সত্ত্বার বাল্য কাল বোঝানো হয়। এই মরমী বাক্য অনেকে জানে, যেটা মার্কিন নিউ এইজ ধারে 'হলিস্টিক' (holistic) নামে পরিচিত। কিন্তু বাস্তবায়ন করার গভীরতা অনেকে উপলব্ধি করতে জানে না: 'যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে'। স্রষ্টার সৃষ্টি পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারলে, স্রষ্টার উপলব্ধি করা যাবে। অতএব জীব, প্রকৃতির একটা অংশ হয়ে, স্থুল থেকে সিদ্ধ পর্যন্ত একইসঙ্গে এই নানান স্তরে যদি তার মুক্ত বিবেক রাখার চেষ্টা সফল হয়, সেই মানুষ তাহলে পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হয়। এই পুরুষোত্তমের নাম কি কৃষ্ণ না কি আল্লাহ্, কি খোদা না কি ঈশ্বর, তাঁর নিরাকার অবস্থান থেকে আকার রূপ ধারণ করেই — সুতরাং চেতনার পরম শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইহুদি ধর্মে বলা হয় যে, এই নিরাকার আদ্য শক্তিকে একটা নামে আটকান যায় না, বরং তাঁর যেকোনো একটা নাম উচ্চারণ করাটা হারাম। ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, এই কঠোর আইনের দরুন যেকোনো একটা নামে তাঁকে চিহ্নিত করতে গেলে তাঁকে আকারে

ভাবা হয়। ফলে, তাঁর গুণকীর্তন বা প্রশংসা করা যাবে, মাত্র যদি যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় তাঁর বর্ণনা করতে, এই সব শব্দের সীমানাকে উপলব্ধি করা, বোঝা ও মেনে নেওয়া হয়। এখানে আমার গুরুর একটা কথা মনে পড়ে — 'জ্ঞানীর জন্য ধর্ম'। তাই, বঙ্গের ঐতিহ্যের সংস্কৃতি থেকে সাধুসঙ্গে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ হিসেবে ডেকে দেওয়া হয়। মনুষ্য রূপে তাঁর জীবনযাত্রা বাস্তবায়ন করা হয় ভাব দিয়ে, গোপাল স্তর থেকে (গোষ্ঠ লীলা), রাধাকৃষ্ণের রাগ-অনুরাগ হয়ে (রাধাকৃষ্ণলীলা বা ব্রজলীলা), তাঁদের পূর্ণ মিলন পর্যন্ত (যুগল মিলন)।

আমাদের গুরুর কাছ থেকে শুনেছি যে, তাঁর গুরু একটা নিয়ম করে দিয়েছিলেন, তবু নিয়মটি অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এই নিয়মটা ছিল যে, ছয় থেকে দশ জন সাধুকে বিশেষ একটা দাওয়াতের মাধ্যমে (পান ও সুপারি দিয়ে) অগ্রিমভাবে ডেকে রাত বারোটা পার হতে না হতে তাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে তাদের আসনের দায়িত্ব দেওয়া হতো। এই দায়িত্বটি বাস্তবায়ন করা হতো শ্রীচৈতন্যের মাকে ডেকে, কৃষ্ণ দাস ভণিতায় ব্রজলীলায় বিশেষ একটি আগমনের দৈন্য গানের বাণী পরিবেশনের মাধ্যমে, যথা:

বারেক দয়া করো এসে শ্রীশচীর নন্দন (২), সর্ব চিত্ত করো আকর্ষণ।
(তোমার) লীলামৃত বরিষণে, সঞ্চারিত চৌদ্দ ভুবনে (২)
জীবের কারণে, বিন্দু করো বরিষণ॥

তুমি গোলক ত্যাজিয়ে এলে হে চলে, ওহে ব্রজলীলা করে সাঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গপাঙ্গ।
হে ত্রিভঙ্গ অঙ্গে অঙ্গ মিশাইলে (২) তুমি করঙ্গ কৌপিন ধারণ করিলে (২)
তোমার এ কি চমৎকার লিলে, অচণ্ডালে কোলে নিলে (২)
লীলাতে সকলি নিলে, করো লীলা সম্বরণ॥

তুমি কলিযুগে করো হে ধর্ম স্থাপন, কলিযুগে স্বনাম ধন্য, প্রকাশ হরি সংকীর্তন।
কলিযুগে এসেছ হে জীবেরই কারণ (২), তুমি জীবের কৃপা করো হে পতিত পাবন (২)
ধন্য ধন্য কলিযুগে ধন্য, উদয় হ'ল শ্রীচৈতন্য (২)
জীবের জন্য অবতীর্ণ, করো কলুষ বিনাশন॥

এসো চৌষট্টি মহান্ত সবে মিলি, দ্বাদশ পূরী ভারতী, আট কবিরাজ ছয় চক্রবর্তী,
ছয় গোঁসাই আর নয় মঞ্জুরি (২), শ্রীঅদ্বৈত প্রেম যাহার কান্ডারি॥
(আমার) নিতাই নিত্যের এই পদার্থ, নিতাই চৈতন্যের পাত্র (২)
শাখা উপর শাখা যত, সকল কাজই লইলাম স্মরণ॥

দীন কৃষ্ণ দাসে করে মিনতি, দণ্ডে তৃণ ধরে বলি, ভক্ত রজঃপদ ধূলি,
অঙ্গেতে মাখি এ প্রাণ জুড়ায় বলি (২), আমায় কৃপা করো ভক্তবৃন্দ সকলি (২)
করি জোড় প্রণিপাত, ভক্তবৃন্দ আদি যত (২) আমারে করো কৃতার্থ, আশা পূর্ণ হয় যেমন॥

এই বাণীটি এই প্রবন্ধ লেখার পর্যন্ত মাত্র একবার শুনেছি, তাও আমাদের গুরুর কাছে বিশেষ অনুরোধে। এই বাণী আমাদের গুরুর কণ্ঠে ভিডিও ধারণ করে রাখা হয়েছে তাঁর 'হেম আশ্রম' নামের ইউটিউব চ্যানেলে ॥

গ.১/ গোষ্ঠ লীলা

তিন-চারটা চরিত্রের মধ্যে তর্কবিতর্ক করা হয় এই গোষ্ঠ লীলায়, ভোর বেলাতে — গোপাল নিজে, গোপালের মা যশোদা, রাখালগণ...। নিয়মিতভাবে সাধুসঙ্গে যেতে পারলে গোষ্ঠের অনেক বাণী শোনা যায় — সময় বুঝে উপস্থাপন করা হয়। ভণিতায় পাওয়া যায় ফকির লালন সাঁই অবশ্য, দাস পিতম্বর ('জীবন কানায় আয় রে গো চারণে', 'জননী গো, বিনয় করি তোরে', 'গোষ্ঠে বিদায় দেবো না গোপালে'), নীলকণ্ঠ ('মা যশোদে তোর কৃষ্ণ ধন দে', 'বেড়োরে কানায়'), ফকির ঝড়ু শাহ্ ('ওঠোরে ওঠোরে গোপাল', 'ওঠো নন্দলাল, এল ধেনুর পাল', 'কে ডাকিলে প্রভাত কালে') ও অন্যান্য। ২০০৬ থেকে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, যুক্তরাজ্য প্রবাসি রঙ্গন মোমেন বাংলাদেশে এসে উচ্চমানের প্রযুক্তি দিয়ে, সাধুগুরুর কণ্ঠে গোষ্ঠ লীলা ধারণ করেছিলেন, এবং 'সাধু গুরু বৈষ্ণব রেকর্ডিংস' লেবিলে একটা সিডিও প্রকাশ করেছিলেন, 'বাউল ফকির গোষ্ঠ লীলা — মা যশোদা ও রাখালগণের কথোপকথন' নামে। এই লেবিলে আর অন্যান্য পেইজ থেকে এবং সাউন্ড ক্লাউড (SoundCloud) ওয়েবসাইটে আরও অনেক গোষ্ঠ গান পাওয়া যায়।

সময় কম হলে কম পক্ষে ফকির লালন সাঁইয়ের এই চারটি বাণী বলা হবে: 'গোষ্ঠে চল হরি মুরারি', 'গোষ্ঠে আর যাব না মাগো', 'বলরে বলাই তোদের ধরম কেমন হারে' আর 'মা যশোদে তাই আজ বল্লে কি হবে'। এই চারটি বাণী যেভাবে সাধুগুরু বলে, সেইভাবে নিচে লিখে রাখলাম:

গোষ্ঠে চল হরি মুরারি।
লয়ে গো ধন, গোষ্ঠের কানন, চল গোকুল বিহারী॥

তুই আমাদের সঙ্গে যাবি, বনফল সব খেতে পাবি।
আমরা ম'লে তুই বাঁচাবি, তাই তোরে সঙ্গে করি॥

ওরে ও ভাই, কেলে সোনা, চরণে নূপুর নে না।
মাথাই মোহন চূড়া দেনা, ধরা পড়ো বংশী ধারী॥

যে ত্বরাবে এই ত্রিভুবন, সেই যাবে আজ গোষ্ঠের কানন।
ঠিক রেখ মন উভয় চরণ লালন, ঐ চরণের ভিখারী॥

এর পরে:

গোষ্ঠে আর যাব না মাগো, দাদা বলাইয়ের সনে।
বলাই দাদা, দাদার দোয়া নাই প্রাণে॥

বড় বড় রাখাল যারা, ও মা বসে থাকে তারা।
আমায় করে জ্যান্তে মরা, বনের ধেনু ফিরানে॥

ক্ষুধাতে প্রাণ আকুল হয় মা, ধেনু রাখাল বল থাকে না।
বলাই দাদা বোল বোঝে না, দাদা কথা কয় হেনে॥

বনে গিয়ে রাখাল সবাই, বলে এসো খেলি কানাই।
হারিলে মোর স্কন্দে চড়ায়, ও মা চড়ে তখনে॥

তোরাই যা সব রাখালগণে, আমি আজ যাব না বনে।
খেলব খেলা আপন মনে, ফকির লালন তাই ভনে॥

এর পরে:

বল রে বলাই তদের ধরম, কেমন হারে।
তোরা বলিস সব রাখাল, ঈশ্বর গোপাল, সেই গোপালকে মানিস কই রে॥

বনে যত বনফল পাও, এঁটো করে গোপালকে দাও।
তোদের এ কেমন ধর্ম, বল সেই মর্ম, আজ আমারে॥

আমারে বোঝাও রে বলাই, তোদের তো সে জ্ঞান কিছু নাই।
তোরা ঈশ্বর বলিস যার, স্কন্দে চড়িস তার, কোন বিচারে॥

গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায়, কেঁদে কেঁদে বলে আমায়।
ফকির লালন বলে তার ভাব বুঝা ভার, এই সংসারে॥

এবং সর্বশেষে:

মা যশোদে গো, তাই আজ বল্লে কি হবে।
গোপাল কে যে এঁটো দিই মা, মনেতে যে ভাব ভেবে॥

মিঠা বলে এঁটো দিই মা, পাপপুণ্যের আর জ্ঞান থাকে না।
গোপাল খেলে হয় সান্ত্বনা, পাপপুণ্য আর কে ভাবে॥

স্কন্দে চড়ায়, স্কন্দে চড়ি, যে ভাব ধরায়, সেই ভাব ধরি।
এ সকল বাসনা তারি, ছিল যে পূর্বে॥

গোপালের সঙ্গেতে যে ভাব, বলতে আকুল হই মা সে সব।
লালন বলে পাপপুণ্য লাভ, ভুল হয় গোপালকে সেবে॥

সাধুসঙ্গের বাল্যসেবায় বঞ্চিত হয় না শিশুরাও। রাজন ফকিরের খাবার বন্টনে আনন্দময় রূপ

গোষ্ঠ লীলা উপস্থাপনা হওয়ার পরে খুব হাল্কা করে মাখান মুড়ি পরিবেশন করা হয় হাতে হাতে। এর পরে, সকালের গুরুকর্ম (ধূপ, চাল-জল, সাধুগুরুর চরণে ভক্তি) করার পরে, বাল্য সেবা পরিবেশন করা হয়, পারশের একই নিয়ম।

বাল্য সেবা নিয়ে আমি কয়েকটা লেখা বর্ণনাতে পড়ে দেখেছি নাকি যে সর্বপ্রথমে গ্রামের সন্তানকে দেওয়া হয়, এর পরে মাত্র সাধুগুরুকে... এই নিয়মটি যদি প্রচলিত হয়ে থাকে কোথাও, তবে আমাদের গুরুর কূলে নেই। প্রথমে সাধুগুরু ও ভক্তবৃন্দকে সেবা দেওয়া হবে, এর পরে গ্রামের বাশিন্দা উপস্থিত হয়ে পড়লে, তাদের দেওয়া হবে৷৷

গ.২/ রাধাকৃষ্ণ লীলা ও যুগল মিলন

প্রেমের রহস্য নিয়ে অনেক মানে অনেক অনেক কিছু লেখা হয়েছে, প্রাচীন যুগ থেকে। সক্রেটিসের 'দ্যা স্যিম্পসিউম' বলুন, বাৎস্যায়নের কামসূত্র বা রুহৎ-এর রতি শাস্ত্র বলুন, একাধিক উপন্যাস ও নাটক বলুন, অস্বীকার করা যাবে না যে, যুগে যুগে প্রেম হল মানুষের অন্যতম একটা চিন্তা। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি তো বুঝায় সৃষ্টি-স্রষ্টার মিলন — যেটাকে সুফি সাধনার ভাষায় 'ফানা' বলা হয়, যেটা মধ্যযুগের খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব বলা হয় পবিত্র বিয়ে-সাদি, গুরুবাদী দর্শন অনুযায়ে গুরুশিষ্য বা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন — সেটা আমাদের সাধুসঙ্গের ক্ষেত্রে রূপক হিসেবে কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম কাহিনী বা লীলা দিয়ে বোঝানো হয়। গত শতাব্দী থেকে নৃবিজ্ঞানীর গবেষণায় দেখে গিয়েছে যে, ন্যারেটিভ (narrative) — কাহিনী — একটা নির্দিষ্ট সমাজে, আনুষ্ঠানিক আচার (ritual) দিয়ে তার পরিচয় একটাই ধাপে দুটি নির্মাণ ওপ্রকাশ করে। মিথ (myth) মানব সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, ধর্মের সাথে জড়িত। ধর্মতত্ত্ব (religious studies) নিয়ে যখন পড়াশোনা করতাম, তখন religion বলতে, প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা থেকে দুইটা সম্ভব ব্যুৎপত্তি বারেংবার উল্লেখ করা হতো: religare, যার অর্থ 'আবার যুক্ত করা', আর relegere, যার অর্থ 'আবার পড়া', অথবা সচেতনভাবে বিবেচনা করা। এই সাধুসঙ্গের চুড়ায়, দুইটা অর্থও মেনে নেওয়া যায়... ঐতিহ্য পালা গানের রূপে প্রকাশিত।

এখানে ভাব ও সময় বুঝে নানান বাণী উপস্থাপনা করা হয়, সব বাদ্যযন্ত্রে সুর-তাল দিয়ে — দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রাধাকৃষ্ণ লীলায় চারটি পর্ব থাকে। ভালোবাসায় শুরু করে, ভুল বুঝাবুঝি (যেমন, চণ্ডী দাসের 'তুমি ভালো ভালো ভালো', বা লালন সাঁইয়ের 'কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে'), মান বন্ধন বা অপমান-অভিমান (যেমন, লালন সাঁইয়ের 'যাও হে শ্যাম রাইকুঞ্জে আর এসো না', বা 'এই গোকুলে শ্যামের প্রেমে কে বা না মজেছে সখী'), আর বিচ্ছেদ (যেমন, ফকির মকছেদ আলী সাঁইয়ের 'গোকুলে গোবিন্দ নাই', বা বিজয় সরকারের 'বৃন্দাবন অন্ধকার আজি শ্যাম ব্রজে নাই')।

যুগল মিলন একাধিক কীর্তনের মধ্যে লালন সাঁইয়ের খুব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বাণী 'মিলন হবে কত দিনে' এখানে উল্লেখযোগ্য বলে রাখলাম। যুগল মিলনের ভাব আরও স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্যে, আরও দুইটি বাণী, যেটা নিয়মিতভাবে বলা হয় ঐ সময়ে, তাও এখানে লিখে দিলাম: শ্রী রাধা মাধবের ভণিতায় 'রাধা গোবিন্দ আনন্দ মনে দোঁহে বিরাজিত এক আসনে', আর গবীন গোঁসাই ভণিতায় 'নবীন শ্যামের বামে নবীনা কিশোরী রে'। মৌখিকরীতিতে পাওয়া গানটির পূর্ণরূপ হলো—

নবীন শ্যামের বামে, নবীনা কিশোরী রে।
শ্যাম নামে জল ধরো, যেমন সৌদামিনী রে৷৷

শ্যামের গলে বন মালা, রায়ের গলে মতি রে,
মালা করে ঝলমল মতি করে আলো রে॥

রায় আমাদের রসের নদী, দুকূল পাথার রে,
তাহে শ্যাম মত্ত হয়ে দিতেছে সাঁতার রে॥

দুইয়ে তনু ভিড়াভিড়ি, জড়াজড়ি বাহুরে
পূর্ণিমার চাঁদ যেমন গ্রাসিছে রাহুরে॥

হাড়ের ঘরখানি চামড়ার চাওনি রে
তার ভেতরে বিরাজ করে সাঁই গুণমণিরে॥

গোঁসাই গবীন চাঁদে বলে উপায় কি করি রে,
রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলন মুখে বল হরি হরি রে॥

যুগল মিলনের সময় কম পক্ষে দশ জন সাধুগুরুকে গাঁদা ফুলের মালা (টাকা দিয়ে গেঁথে) পরানো হয়, প্রথমে সভাপতিকে, এরপরে ভিন্ন ঘরের সাধুকে, এর পরে বাকি নির্বাচিত সাধুগুরুকে। পরানোর সময়, বিশেষ একটা নিয়ম পালন করা হয় – দুই হাত দিয়ে মালাটি ধরে ভক্ত সাধুর সামনে এসে একটা কাঁধে আর অন্য কাঁধে স্পর্শ করে, মালাটি ঘুরাবে তিন বার সাধুর মুখের দর্পণে। তারপরে মালাটি সাধুর গলায় পরাবে। পরিয়ে চরণে ভক্তি হবে। সাধুসঙ্গে যে ভাব ধরে এই সময়, যারা সমলয় হতে পেরেছে তাদের চোখে এই কঠিন ভাবটি জল টানে... গোলাপ জল ও হরিলুট নামে মুড়ি ও গাঁদা ফুলের পাপড়ি মেশানো, ছিটানো হয়। এই হরি লুট নাম ধরেছে সর্বসৃষ্টিকে ভোগ করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে – উপস্থিত মানুষ তো অবশ্যই পবিত্র প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করবে, কিন্তু পশু-পাখি ও পোকাও গ্রহণ করতে পারবে সাধুসঙ্গের শেষে যখন কাঁথাগুলো ঝেড়ে দেওয়া হবে।

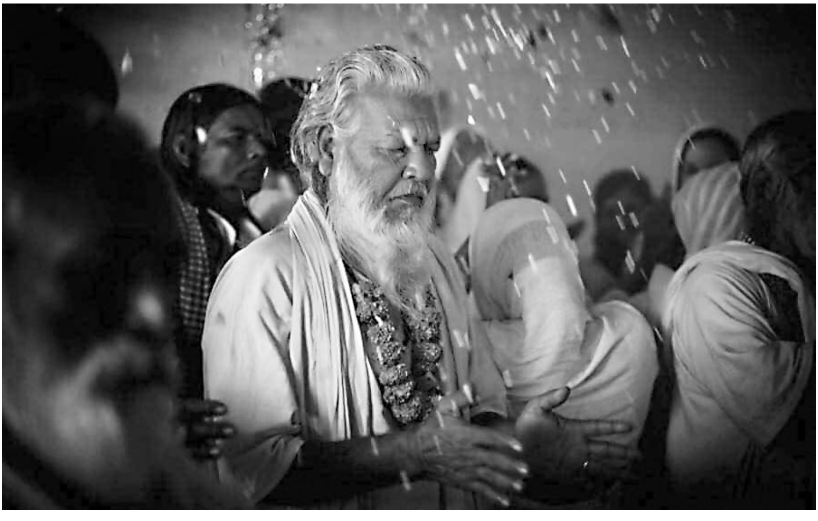

সাধুসঙ্গে হরিলুটে মুড়ি ও গাঁদা ফুলের পাপড়ি মেশানো বৃষ্টিতে মগ্ন ফকির মোজাম শাহ

যুগল মিলনের পরে সাধুসঙ্গের সমাধান, পূর্ণ সেবা নামে, পরিবেশন করা হয়। এই পূর্ণ সেবার পরে পারশ ঢেকে আয়োজক ও তার কালান্দারি যারা, তারা হাত অঞ্জলি ধরে মাথায় একটা খোলা কাপড় পরে সাধুগুরুর কাছে ক্ষমা চাইতে আসে। কেননা, কাজ করতে গেলে ভুল হবেই, কিন্তু ক্ষমাশীল দয়াময় করুণাময় সাধুগুরু মাফ করে দিতে পারেন, অনুতপ্ত মনে যদি ক্ষমা চাওয়া হয়। এখানে, সাধুগুরুর দিকে তাকিয়ে, এই কথা নত মুখ দিয়ে বলা হয়: 'সাঁইজি, সাধুগুরু, আমি আপনাদের সেবা দেওয়ার যোগ্য নই। সাঁইজি যতটুকু করালেন, ততটুকু করলাম। আমার সেবার মধ্যে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, আপনাদের নিজগুণে ক্ষমা করে দিবেন'। এই কথা বলে সাধুগুরুর মার্জনা নিশ্চিত করে সেজদা হয়ে, ভয়-ভক্তি দেখিয়ে পারশ তোলা হয়। পারশ তোলার পরে সেবা দক্ষিণা দেওয়া হয় সব উপস্থিতি অতিথিদের। এই দক্ষিণা গ্রহণে সাধুগুরুকে বিদায় দেওয়া হয়। এখানে সাধুসঙ্গের শেষ।

উপসংহার

এই অংশের রেখেছিলাম লালন সাঁইয়ের প্রবর্ত গানের একটা বাণীর কিছু কথা মনে আসে, যেটা পড়লে (বা শুনতে পারলে!) আমাদের পথ-মতের মূল দর্শন বোঝা যাবে। এই বাণীর কথাগুলো এখানে লিখে রাখলাম:

ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।
সর্ব সাধন সিদ্ধি হয় তার॥

নদী কিংবা বিল বাঁওড় খাল, সর্ব স্থানে একই এক জল।
একা মেরে সাঁই, ফেরে সর্ব ঠাঁই, মানুষে মিশে হয় বেদান্তর॥

নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে, আকারে সাকার রূপ ধরে সে।
যেজন দিব্য জ্ঞানী হয়, সেহি জানতে পায়, কলিযুগে হয় মানুষ অবতার॥

বহু তর্কে দিন বয়ে যায়, বিশ্বাসের ধন নিকটে পায়।
সিরাজ শাহ্ ডেকে, বলে লালনকে, কুতর্কের দোকান খুলিস নে আর॥

এই প্রবন্ধের শেষে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ নিচ্ছি। এই লেখার পেছনে, ব্যক্তিস্বার্থ দাঁড়িয়ে আছে। প্রাথমিকভাবে, রক্ষণশীল ধর্মীয় সমাজ দীর্ঘদিন যাবত বাউল-ফকির-সাধুর বিরুদ্ধে নানান ফৎওয়া দিয়ে ভুল ধারণা ও বদনাম ছড়িয়েছে। লালন সাঁইয়ের গুরু সিরাজ শাহের আদেশ মানতে গেলে তর্কবিতর্ক করতে নেই। কিন্তু আমার গভীর একটা বিশ্বাস আছে যে, জানাতে পারলে, বেশিরভাগ মানুষ জানতে চায় — ভুল বোঝার কারণে রাগ জাগে। এই বিদ্বেষ বিশেষভাবে দেখা দেয় গণমাধ্যমে, যেখানে সব কিছু একই মাপে দেখা হয়, যেখানে বিবেচনা শক্তি তৈরি না হলে সবকিছু অবিচারে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। না দেখে, না জেনে এই সব বিভ্রান্তি নিয়ে চলছে অনেকে — তাদের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখছি, সাধুগুরুর নিরাপত্তার জন্যে।

সাধুসঙ্গে গোপন রাখার কিছুই নেই আমাদের, এবং সামান্য সহিষ্ণুতা থাকলে মনে দেখা যাবে ঘৃণিত বা লোভনীয় বলতে কোনো কাজও নেই।প্রভু যদি মহাবিচারপতি হয়ে

সাধুসঙ্গের কৃত্যানুষ্ঠানের সাধুগুরুদের মধ্যে প্রাবন্ধিক ও লালনপন্থী সাধিকা দেবোরাহ জান্নাত

দাঁড়ান, তাহলে বিচার করা ও রায় দেওয়ার ক্ষমতা তাঁরই হাতে রাখা উত্তম। দ্বিতীয়ত, যারা দেখতে আসেন কিংবা আসতে চান, যেন তারা বুঝে আসতে পারেন, এবং এসে মনের তাল ও লয় মিলাতে পারেন— এই উদ্দেশ্যও মনে রেখেপ্রবন্ধটি লিখলাম। আমাদের গুরু বলেন যে, ধর্মের তিনটা খুঁটি — ঈমান, একতা, শৃঙ্খলা। প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে পাঠক যেন এই তিনটি গুণাগুণ খুঁজে পান আমার ক্ষুদ্র বর্ণনায়— এই আশাটি রাখলাম।

মানুষের ব্যবহারের যেকোনো বস্তু বা অভ্যাস যখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে — কি নতুন প্রযুক্তি এসে বা কি সমাজের চেতনার পরিবর্তনে — সেই অভ্যাস বা বস্তু হারিয়ে যায়। অর্থাৎ সামাজিক অভ্যাস ও অভাস্যের অর্থ শুধু যে পরিবর্তনশীল তা নয়, তার উপরে সংখ্যাগুরুর ক্ষমতা খেলায় জড়িত হয়ে, সাধারণ থেকে ভিন্ন বা ব্যতিক্রম অন্বেষণকে সমর্থন করে না।

আধুনিকতায় ও বিলাসী বিনোদনে, এবং হিসাবী ধর্মের কারণে, মরমীয়ার অর্থ খুঁজে পাওয়ার কৌতূহল কমে গেছে। তার আশপাশে, জাতীয় পরিচয় বিলীন হতে যাচ্ছে বিশ্বায়নে। কিন্তু মানুষের মন, বিস্ময় রহস্যের উপলব্ধি ও মুক্তির পিপাসা পরিবর্তন হয়নি, হবেওনা। তাই, এই প্রাচীন অমূল্য জ্ঞান রক্ষা করতে চাইলে, জড়িত তার চর্চার ভিত্তি, তার সামাজিক রীতিনীতি জীবিত রাখতে হবে, মানুষের নিত্য ব্যবহারে। সাধুগুরুর অমিয় বাণীগুলি, বাংলা সাংস্কৃতিক কবিতা বা গান হিসেবে দেখলে কাজ হবে না, প্রমাণিতভাবে হচ্ছেই না — বাণীর পেছনে যে বিনয়, গভীর ভক্তি, ত্যাগ, সাধনা ও সিদ্ধি প্রাপ্তি থাকে, সেটা অনুভব করতে পারলে তবে এই ধারা জীবিত থাকবে। স্বাধীনতা ও মুক্তির মধ্যে 'লক্ষ যোজন ফাঁক রে', লালন সাঁইয়ের 'বাড়ির পাশে আরশি নগর' বাণীর শেষ কথার প্রতিধ্বনি করে মনে পড়ছে। আধুনিক যুগে অনেকে স্বাধীন হয়ে গেছি, কিন্তু মুক্ত হইনি। এই প্রবন্ধটি পড়ে, যদি কেউ উৎসাহিত হয় আমাদের সঙ্গে

হাঁটার জন্যে কি দুদিন কি দুজীবনে, কেননা সাধুসঙ্গের সাক্ষী হওয়া বা পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করা মাত্র হলেও, তাহলে এই কাজের সফলতা মনে করতে পারব। জয়গুরু, জয় জয় সাধুগুরু। আলেক সাঁই।

৬/১২/২০২১ - প্রাগপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

আলোকচিত্র: অলিভিয়ে রেমুয়ালডো (Olivier Remualdo)

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই

আবুল আহসান চৌধুরী, *লালনসমগ্র*, ২০১৪ (২০০৮): পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

---------, *বাউল ধ্বংস ফৎওয়া ও অন্যান্য*, ২০১৪: পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

আশিস সরকার, *বাংলার লোকগান*, ২০১৮: বলাকা, কলকাতা

উপেন্দ্রানাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ১৪২৬ (১৩৬৪) বং: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

ওয়াকিল আহমেদ, *লালন গীতি সমগ্র*, ২০১৮ (২০০২): বইপত্র, ঢাকা

সুধীর চক্রবর্তী, *গভীর নির্জন পথে*, ২০১৭ (১৯৮৯): আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

---------, *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*, ২০১৮ (২০১১): নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

স্বামী প্রভুপাদ, *লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ*, ২০১৬ (১৯৮৩): ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই

ইংরেজি বই

Bell, Catherine, 1992, *Ritual Theory, Ritual Practice*, Oxford, UK: Oxford University Press

Grimes, Ronald L., 1996, *Readings in Ritual Studies,* Upper Saddle River, USA: Prentice Hall

Mauss, Marcel, 1954 (1925), *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies,* Glencoe, USA: Free Press

Polanyi, Karl, 2001 (1944), *The Great Transformation,* Boston, USA: Beacon Press

Rappaport, Roy A., 2012 (1999), *Ritual and Religion in the Making of Humanity,* Cambridge, UK: Cambridge University Press

গানের অডিও

Gostho Lila on SoundCloud : *Sadhu Guru Boishnob Recordings*, Baul Bari,

[বি.দ্র.: প্রবন্ধ ব্যবহৃত গানের বাণীগুলো প্রাবন্ধিক তাঁর গুরু লালনপন্থী সাধক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির নহির শাহের নিকট থেকে মৌখিকভাবে গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, গানগুলোর বাণীর নানা ধরনের পাঠ-পাঠান্তর লালন সাঁইয়ের সাক্ষাৎ-শিষ্যদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসহ প্রকাশিত গ্রন্থে ও মৌখিকভাবে প্রচলিত রয়েছে। — সম্পাদক]